000004

সংবাদ

তারিখ ২৫/৯/৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ...

সংবাদ

ঢাকা : রোববার, ৮ই আশ্বিন, ১৩৯০

গণসাক্ষরতা কর্মসূচী

বিগত সরকারের আমলে বিপ্লব বহুরূপে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিল। খালকাটা বিপ্লব, শিক্ষা বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব ইত্যাদি নামগুলো ঘন ঘন উচ্চারিত হত। এর মধ্যে খালকাটা বিপ্লবের উপর জোর পড়েছিল বেশি। আর শুরু হয়েছিল সেখান থেকেই 'বিপ্লব' শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার। দেড় দু'বছরে খালকাটা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু তাতে কৃষি উৎপাদন বেশিদূর এগোয়নি। কারণ কোন খাল খনন উদ্বোধনের পর কাজ হয়েছে ঢিমে-তালে, ত্রুটিপূর্ণভাবে আর সমগ্র খাল খননের ক্ষেত্রে কোন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ছিল না। স্বেচ্ছাশ্রম আর জনগণের অংশগ্রহণের যে সচিত্র ছবি টিভি দর্শকরা উপভোগ করেছে, তার বাইরে তার সার্থকতার পরিমাপ আজও হয়নি।

শিল্প বিপ্লব বলে যেটা চালানোর চেষ্টা হয়েছে, তা ছিল প্রকৃতপক্ষে '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ-পূর্ব উৎপাদনের স্তরে কলেকারখানায় উৎপাদন মাত্রা পৌছানো। এখানেও শুভংকরের ফাঁক কাজ করেছে। একবার মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কিছুটা অসন্তোষের কণ্ঠেই বলেছিলেন যে, তাঁর কাছে উৎপাদনের অগ্রগতির যে চিত্র হাজির করা হয়েছে, তা ঠিক নয়। তিনি উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতিকদের মুখে "বিপ্লবী পরিস্থিতি" জাতীয় কথাবার্তা শুনে কিনা জানি না, বোধহয় ধরে নিয়েছিলেন যে, "বিপ্লব" শব্দটা কোন কর্মের নামের সাথে যুক্ত করতে পারলেই জনগণের প্রেরণা উদ্দীপ্ত হবে।

আর সে জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানকে তিনি 'শিক্ষা বিপ্লব' হিসেবে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। কাজটা শুরু হয়েছিল অনেক আঁটঘাট বেঁধে। কোটি টাকার বই ছাপা হল। বইও লিখেছিলেন বয়স্কদের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব জনাব ফেরদৌস খান।

বিভিন্ন স্কুলে শুরু হয়েছিল গণশিক্ষা ব্যবস্থা। ঢাকার বহু স্কুলের প্রাচীর গাত্রে গণশিক্ষা কেন্দ্রের নামফলক এই সেদিনও চোখে পড়ত। এর উপরও ছিল আয়োজনের বহর। এস এস সি পরীক্ষায় ৫০ নম্বর বাধ্যতামূলক রাখা হয়েছিল পরীক্ষার্থীর জন্য। পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই দু'জনকে সাক্ষর করতে হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণের ক্ষেত্রে এই শর্ত আবশ্যকীয় করে আইন পর্যন্ত করা হয়েছিল। ফল দাঁড়িয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই পরীক্ষার্থীর অভিভাবককে গাঁটের পয়সা খরচ করে সাক্ষর "সাক্ষী গোপাল" দাঁড় করানো। অনেক বাসার স্বল্প লেখাপড়া জানা ভৃত্যদের নসিবে এ সুযোগে অর্থপ্রাপ্তি ঘটেছে পরীক্ষার্থীদের তরফ থেকে। খুব কম ক্ষেত্রে সত্যিকারভাবে সাক্ষর বয়স্ককে পাওয়া গেছে, যারা ছাত্রদের নিকট থেকে অক্ষর পরিচয়ের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিল।

প্রাথমিক স্কুলগুলোর উপর সরকারের সেদিন ভরসা ছিল বেশি। কিন্ত তাদের রাজনৈতিক দাবার ঘুঁটি হিসেবে শেষ পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছে। তারাও তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন। সাবেক অতিরিক্ত শিক্ষা সচিব এখন বলছেন যে, ব্যাপারটা ছিল আবেগের, পদ্ধতিগত কোন ব্যবস্থা ছিল না। সাথে যে কথাটা অনুক্ত তা হলো, আন্তরিকতাও ছিল না তাদের যাদের উপর ভার ছিল একাজের। আরো স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, ছিল রাজনৈতিক ক্ষুদ্র স্বার্থ উদ্ধারের বাহন এই গণশিক্ষার বোল-চাল।

প্রথম উৎসাহে ভাটা পড়ার পর দেখা গেল কেন্দ্রগুলো খাঁখাঁ করছে। পড়ুয়া বুড়ো খোকাদের-খুকীদের পাওয়া যাচ্ছে না। একেবারেই যে পাওয়া যাচ্ছিল না, তা নয়। সেদিনের টিভি পর্দায় অক্ষর লেখার কসরৎ আর উৎসাহী পড়ুয়ার মুখ অবশ্য দেখা গিয়েছিল। আর বইগুলো সের দরে দোকানে গেছে ঠোঙা হয়ে। পত্র-পত্রিকায় নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের ত্রুটি বিচ্যুতি, প্রচার সর্বস্বতা আর বই-এর উপরোক্ত সদ্গতি সংক্রান্ত রিপোর্টে সরকার সেদিন অসন্তোষের [illegible] করেছিলেন। সবটাতেই সরকার-বিরোধিতার আলামত কর্তারা দেখেছিলেন, জনাব ফেরদৌস সাহেব আজ যে কথাটা বলেছেন, সেদিন সরকারী তরফ থেকে সে ধরনের কোন স্বীকারোক্তি শোনা যায়নি। বোধ হয়, কোন সরকার বিগত না হওয়া পর্যন্ত সত্যটা চাপা থাকে সরকার পক্ষের মুঠিতে; আর বিগত হওয়ার পর আসল কথাটা সরকারী পদস্থ কর্তাব্যক্তিরাই বলতে শুরু করেন।

এখন আবার গণসাক্ষরতার কথা উঠছে। নতুনভাবে একাজ শুরু করার চিন্তা-ভাবনা করছেন সরকার। মূল্যায়ন কমিটির তরফ থেকে বলা হয়েছে যে, পদ্ধতিগত দুর্বলতার জন্যই গণসাক্ষরতা সফলতার মুখ দেখেনি; লক্ষ্যছিল যে মূক জনগোষ্ঠী তাদের মধ্যে সাড়া জাগানো সম্ভব হয়নি। মূল্যায়ন কমিটি বোধহয় আর একটু এগিয়ে একথাটাও ভেবে দেখা উচিত যে, উদ্যোগ যারা নিয়েছিলেন এবং যাদের উপর এটা বাস্তবায়নের ভার ছিল, তাদের আন্তরিকতার কোন অভাব ছিল কি না। রাষ্ট্রপতিকে তুষ্ট করা এবং তাঁর কথার প্রতিধ্বনি তুলে সেদিন যারা গণসাক্ষরতা তথা নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের ফিরিস্তি দাখিল করতেন মূল্যায়ন কমিটির তাদের সম্পর্কেও খোঁজ-খবর নেয়া আমরা সমীচীন বলে মনে করি।

সেদিন যখন নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের সংকল্প সরকার ঘোষণা করেছিলেন আমরা উৎসাহিতবোধ করেছিলাম; কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্নভাবে এধরনের কর্মসূচী সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম, একথাটাও বলেছিলাম।

সারাদিন যারা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে কোনমতে উদরপূর্তি করে তাদের সাক্ষর করার কাজটি সচিবালয়ের কক্ষে বসে ছক বেঁধে করা সম্ভব নয়।

তা ছাড়া যে দেশে শিক্ষার উপযুক্ত বয়সের শিশুদের শতকরা ৪০ ভাগ দারিদ্র্যের জন্যই শিক্ষাপীঠের চৌকাঠ মাড়াতে পারে না এবং প্রতিবছরই তারা নিরক্ষরের দল ভারী করছে, সেই সত্যটার দিক হতে চোখ ফিরিয়ে রাখলে গণসাক্ষরতা কীভাবে সফল সম্ভব সে কথা কেউ ভেবে দেখছেন কি?

আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা যেখানে দিন থেকে দিনে ক্রমেই অবনতির দিকে গড়িয়ে চলছে নানা সমস্যার ঘূর্ণিতে পড়ে, সেখানে গণসাক্ষরতা অভিযান এবং এ সংক্রান্ত বিচ্ছিন্ন কর্মসূচী গণিত শাস্ত্রের নিয়মে শেষ পর্যন্ত কি ফল প্রসব করে বিগত সরকারের আমলে এক্ষেত্রে ব্যর্থতা তার বড় নজির। সবক্ষেত্রেই যে আবেগটাই প্রবল ছিল, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা ছিল না এমন নয়। কিন্ত অবস্থার গতি প্রমাণ করেছে সেখানেও গণশিক্ষা কেন্দ্র ছাত্রশূন্য হয়ে পড়েছে।

মূল্যায়ন কমিটি ইতিমধ্যেই তাদের সিদ্ধান্তে পৌছেছেন ধরে নিতে পারি এবং তাদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে সরকার নতুনভাবে গণসাক্ষরতার কর্মসূচী শিগ্গিরই গ্রহণ করবেন, এ রকম আশা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

এক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ একটা নিবেদন, তা হলো, গণসাক্ষরতা কর্মসূচীর সাথে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধারাকে যুক্ত করা হোক। পাশাপাশি নিরক্ষতার মূল উৎস স্কুলগামী বয়সে উপনীত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা চাই। আর এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে অব্যবস্থা, শিক্ষকের অভাব অর্থাৎ হাজার হাজার শূন্য পদে বছরের পর বছর শিক্ষক নিয়োগ না করার সিদ্ধান্তহীন অবস্থাও দূর করতে হবে। শিক্ষাদানের উপযুক্ত পরিবেশ, অন্তত: প্রাথমিক স্কুলগুলোর প্রাথমিক সমস্যা যেমন স্কুল গৃহ মেরামত, শিক্ষক নিয়োগ, টেবিল, বেঞ্চ ও চেয়ারের অভাব দূর করতে হবে।

সবশেষে, গণসাক্ষরতাকে শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উৎস প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে লালন পালন করলে প্রাণরস ধারা যাবে শুকিয়ে। আমলাদের ফাইলের শাসনে, তার পত্র চেহারাটার অভিজ্ঞতাইতো চোখের সামনেই রয়েছে।